
পাহাড়তলির
পথে প্রান্তরে
স্বরূপ গোস্বামী

পাহাড়তলির পথে প্রান্তরে

স্বরূপ গোস্বামী

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর, ২০২৬

যোগাযোগ
বেঙ্গল টাইমস
কেবি ১২, সল্টলেক, কলকাতা ১০৬

ফোন
৯৮৩১২২৭২০১
ই-মেল
bengaltimes.in@gmail.com

উৎসর্গ

বিয়ের সময় অগ্নিসাক্ষী করে স্ত্রীর উদ্দেশে
বলেছিল, সারাজীবন তোমাকে পাহাড়
ঘোরানোর দায়িত্ব নিলাম।

আমার পাহাড় চেনার বিশ্বস্ত এক সঙ্গী
সৌরাংশু দেবনাথকে

পথ চাওয়াতেই আনন্দ

আমার স্ত্রী মাঝেই অনুযোগ করেন, তোমার আর কোনও জায়গা নেই! ঘুরেফিরে প্রতিবার সেই উত্তরবঙ্গ! স্ত্রীর মুখের ওপর কথা বলা ‘শাস্ত্রবিরোধী’। অগত্যা মনে মনে জীবনানন্দ আউড়ে বলি, ‘উত্তরবঙ্গের মুখ আমি দেখিয়াছি। তাই কাশ্মীরের রূপ খুঁজিতে যাই না আর।’

আসলে, তাঁকেও মাঝে মাঝেই এই প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। তোরা বছরে কতবার করে উত্তরবঙ্গে যাবি! আর কি কোনও জায়গা নেই? তিনিও কোনও উত্তর খুঁজে পান না। অতএব, তাঁর দিকে ধেয়ে আসা প্রশ্নটা তিনি আমার দিকেই ছুড়ে দেন।

মনে মনে ভাবি, এবার দুর্নাম ঘোচাতেই হবে। পড়শি রাজ্য ঝাড়খণ্ড বা সিকিমও তো কম হল না। এবার যাব

দূরে, বহু দূরে। বাংলায় পালাবদলের পর এক রাউন্ড হিমাচল-সফরও হয়ে গেছে। বিস্তর ঘোরার পথ ফের এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া গেল, উত্তরবঙ্গের কোনও বিকল্প নেই। এবং গোটা হিমাচল সফরকালীন বিস্তর মতপার্থক্যের মধ্যেও এই একটি বিষয়েই একমত হওয়া গিয়েছিল। এ অনেকটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে আম বাঙালির মেনু কার্ড ঘাঁটার মতোই। গোটা মেনু কার্ড খুঁটিয়ে দেখবে। তারপর অর্ডার দেওয়ার সময় সেই বিরিয়ানি, আর চাইনিজের দিকে গেলে চিলি চিকেন। এভাবেই ঝটিকা সফরে হলেও বছরে বার চারেক উত্তর অভিযান হয়েই যায়। দুপুরে টিকিট কেটে রাতে ট্রেনে উঠে পড়েছি, এমনও হয়েছে।

কয়েকমাস আগেই বেরিয়েছিল ‘তোমার বাড়ি আমার বাড়ি মকাইবাড়ি মকাইবাড়ি’। সেই সংস্করণ ছিল মূলত চা-বাগান কেন্দ্রিক পর্যটন নিয়ে। এবার ইচ্ছে করেই চা-পর্যটনকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এবারের সফর মূলত কয়েকটি পাহাড়ি গ্রামে। যেগুলি

ইদানীং সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে কিছুটা প্রচার পেলেও যখন গিয়েছিলাম, তখন অখ্যাতই ছিল। সব লেখা যে হাতে গরম টাটকা, এমন দাবি করার কোনও মানেই হয় না। বরং মর্গান হাউসের মতোই, পুরনো আমেজটাই ধরে রাখা হয়েছে। এডিট করে নতুন রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়নি।

ভ্রমণের লেখা মানেই তার অনিবার্য অঙ্গ— কীভাবে যাবেন, কোথায় থাকবেন। এগুলোকেও সন্তর্পণে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কারণ, সেগুলো বলার জন্য গুগল নামক সবজান্তা ‘সিধু জ্যাঠা’ আছেন। চারপাশে কী কী দেখার জায়গা আছে, সেদিকেও আলো ফেলা হয়নি। বাঙালি চারপাশটা ঘুরতে গিয়ে আসল জায়গাটাই ঘোরে না। কথাটা দার্জিলিংয়ের ক্ষেত্রেও সত্যি, পুরীর ক্ষেত্রেও সত্যি। বাঙালি খুব ঘটা করে দার্জিলিং যায়, কিন্তু ‘চারপাশ’ দেখতে গিয়ে আর নতুন জায়গার বিস্তর

ছবি তুলতে গিয়ে শেষমেশ দার্জিলিংটাই আর দেখা হয় না।

এই বই মূলত গ্রামীণ পর্যটন নিয়ে। অতএব, তথাকথিত ‘চারপাশ’ এর তেমন হাতছানি নেই। অলসভাবে পায়ে হেঁটে পাড়া বেড়ানো। ‘কোথাও যাওয়ার নেই, কিচ্ছু করার নেই।’ রুম কেমন, বাথরুম কেমন, গিজার আছে কিনা— এসব বিষয়গুলো নিয়ে কোনওকালেই মাথা ঘামাইনি। বরং গ্রামটা কেমন, মানুষগুলো কেমন, সকালটা কেমন, সন্ধেটা কেমন— এই ছবিটাই আঁকতে চেয়েছি। টুকরো টুকরো অনুভূতি, জনপদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ছোট ছোট গল্প— এগুলোতেই আলো ফেলা হয়েছে। আপন খেয়ালে পাহাড়ি ঝোরার মতোই বয়ে যাওয়া। আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ।

স্বরূপ গোস্বামী

তাকদার সেই ব্রিটিশ বাংলোয়

এখানে গেস্ট হাউস? কে থাকতে আসবে এই জঙ্গলে? কেনই বা আসবে?

ছেলের দিকে ঠিক এই প্রশ্নটাই ছুঁড়ে দিয়েছিলেন প্রবীণ মাস্টারমশাই।

ছেলেও নাছোড়। এখানে তিনি গেস্ট হাউস বানিয়েই ছাড়বেন। ঠিকঠাক প্রোমোট করতে পারলে ট্যুরিস্ট ঠিক আসবে।

বাবা-ছেলের এই কথোপকথনটা মোটামুটি বছর পনেরো আগের। পনেরো বছর পরের ছবিটা অবশ্য



বাবা-ছেলে দুজনের পক্ষেই বেশ স্বস্তিদায়ক। হ্যাঁ, সত্যিই এখানে ট্যুরিস্ট আসছেন। সেই চাহিদা এতটাই যে অনেক পর্যটককে নিরাশ হতে হচ্ছে।

আসলে, এই তাকদা শহরের সঙ্গে একটা ইতিহাস জড়িয়ে আছে। একদিকে পাইনের বন থেকে ভেসে আসছে মেঘের সারি। অন্যদিকে, সেই ইতিহাসের হাতছানি। সবমিলিয়ে জায়গাগা বেশ রোমাঞ্চকর।

পাহাড়ের নানা জায়গায় পায়ের ছাপ পড়েছে ইংরেজদের। তাঁরা যত্ন করে সাজিয়েছেন বিভিন্ন জনপদকে। ওই দুর্গম এলাকায় রেললাইন পাতা, রাস্তা তৈরি করা, স্কুল–কলেজ তৈরি করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। আর চা–বাগান! বরং স্বাধীনতার পর আমরা নিজেদের চেষ্টায় কতটুকু এগোতে পেরেছি, সেই প্রশ্নটাই যেন বড় হয়ে ওঠে।

তাকদায় এলে ব্রিটিশ স্থাপত্য যেন আরও বেশি করে মন কেড়ে নেয়। এখানে সেনাবাহিনীর আলাদা ক্যান্টনমেন্ট তৈরি করেছিল ব্রিটিশরা। মোটামুটি ১৯০৫ থেকে ১৯১১ এই সময়ের মধ্যে তৈরি হয় একের পর এক কীর্তি। তৈরি হয় সতেরোটি হেরিটেজ বাংলো। কোনওটি এখন বিলুপ্ত। কোনওটার ভগ্নদশা। কোনওটি হয়েছে স্কুল, কোনওটি গেস্ট হাউস। এভাবেই ইতিহাসের গন্ধ গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে আছে এইসব স্থাপত্য।



ইচ্ছে ছিল, কোনও একটা হেরিটেজ বাংলোয় থাকার। সেখানকার ইতিহাসটাকে একটু ছুঁয়ে দেখার। সেই তাগিদ থেকেই তাকদায় যাওয়ার ইচ্ছে। ইউটিউবের সৌজন্যে বেশ কয়েকটা বাংলোর হদিশ পাওয়া গেল। কোনওটার আকাশছোঁয়া ভাড়া। কোনওটায় আবার বুকিং নেই। সবমিলিয়ে জায়গা হল সাইনো গেস্ট হাউসেই। ইউটিউবের ভিডিও দেখে প্রাথমিক একটা ভাল লাগা তৈরি হয়েছিল। বাকিটা তো গিয়েই বুঝতে হবে।

তাকদা যাওয়ার রাস্তাটা বেশ উপভোগ্য। দুধারে পাইন গাছের সারি। মেঘ ভেসে আসছে। দিনের বেলাতেও কেমন একটা গা ছমছমে অনুভূতি। এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার রোমাঞ্চই আলাদা। দার্জিলিং থেকেও আসা যায়। আবার কালিম্পং থেকেও আসা যায়। দুদিক থেকেই মোটামুটি ঘণ্টা দেড়েকের পথ।

সব বাংলোগুলোই রাস্তা থেকে অনেকটা উপরে। সাইনোও তাই। সামনে লন। বিরাট বারান্দা। ফায়ারপ্লেসের চিমনি, দরজা–জানালাই জানান দিয়ে যাচ্ছে, বাংলোটা কত পুরনো। লনেই দুদিকে রয়েছে ফোয়ারা। আধুনিক অঙ্গশয্যা নয়, ইতিহাসেরই গন্ধ মাখা। কিন্তু আমাদের বিধি বাম। যাওয়ার পর থেকেই ঝিরঝির বৃষ্টি। ফলে, বাইরে বেরোনোর তেমন উপায় নেই। অবশ্য শুধু বৃষ্টি উপভোগ করতে হলেও তাকদার এই বাংলো আদর্শ। আপনমনে বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখুন, বই পড়ুন, গান শুনুন বা

গুনগুন করে গেয়ে উঠুন। আলস্য যাপনের এমন সুযোগ খুব বেশি আসে না। পাহাড় মানেই তো শুধু চড়াই উতরাই নয়। এমন বাংলো তো আলস্যকেই আমন্ত্রণ জানায়।

নিচের চারটে ঘর পর্যটকদের জন্য। ওদিকের দুটো ঘর কিচেন আর ডাইনিংয়ের কাজে ব্যবহার হয়। ওপর তলায় থাকেন প্রবীণ দম্পতি। দুই কেয়ারটেকার নিরন আর রোশন। নিরনের বাড়ি মালবাজারে। বেশ লাজুক। রোশনের গানের গলাটা চমৎকার। গলায় ক্লাসিকাল টাচ। কঠিন কঠিন গানগুলোকেও কী নিখুঁত সুরে গাইছে। আমাদের ঠিক পাশের ঘরেই ছিল এক নবীন দম্পতি। দেবমাল্য আর দেবাঞ্জলি। দুজনেই কৃতী ইঞ্জিনিয়ার। বেশ প্রাণবন্ত জুটি। দাম্পত্য আর নিবিড় বন্ধুত্ব যেন হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। সন্ধে থেকে তাঁদের সঙ্গে নানা বিষয়ে গল্প করে দিব্যি কেটে গেল।



বেড়ানোর সঙ্গে খাওয়ার একটা অনুষঙ্গ না থাকলে তা পূর্ণতা পায় না। পাহাড়ে গিয়ে ক্যালোরির হিসেব চুলোয় যাক। নিরন বা রোশনের হাতের সেই সুন্দর রান্নাকে অসম্মান করার কোনও স্পর্ধা নেই। দুপুরে বাঙালি আদলে, রাতে কিছুটা চৈনিক সংস্কৃতি। সবমিলিয়ে বেশ উপভোগ্য। ইচ্ছে ছিল, ভোরের দিকে যদি কোথাও বেরোনো যায়। নিদেনপক্ষে উপরের গুম্পায়। কিন্তু কোনওটাই হল না। কারণ, ঘুম ভাঙল বেশ দেরিতে। মেঘ একটু একটু করে সরেছে। দূরের

পাহাড়গুলো একটু একটু করে স্পষ্ট হচ্ছে। ওই তো, ওই দিকটায় তিনচুলে। ওই যে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে রংলি রংলিয়ট চা-বাগান।

কিন্তু এই বাংলোর ইতিহাসটাই তো জানা গেল না। কে বলতে পারেন? ফোনে যাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছিল, সেই আনন্দজি থাকেন কার্শিয়াংয়ে। বেচারা নিরন বা রোশনের পক্ষে এত ইতিহাস জানা সম্ভব নয়। একমাত্র উপায়, আনন্দজির বাবা। প্রবীণ ওই মানুষটিকে বেশ কয়েকবার দেখেছি। বেশ সাহেবি চেহারা। দূর থেকে দেখেই বেশ সমীহ জাগছে। এই বয়সেও বেশ সক্রিয়। বেশ কয়েকবার নিচে নামলেন। এদিক-ওদিক হেঁটে বেড়ালেন। ইচ্ছে হল, তাঁর কাছেই দু-চার কথা শুনি। কিন্তু তখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন। বললেন, একটু পরে আসছি।

একটু পরে এলেন। কথা বলে গেলেন মূলত হিন্দি

আর ইংরাজিতে। তবে বাঙালি নামগুলো উচ্চারণ করলেন একেবারে নির্ভুল বাংলা উচ্চারণে। তাঁর কাছে যা যা জানলাম, সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। এখানে শুধু তার নির্যাসটুকুই লেখা যায়। তাঁর বয়ানেই বাকিটা শোনা যাক। ১৯০৫ নাগাদ এখানে ক্যান্টনমেন্ট তৈরি হয়। এরকম ১৭টি বাংলো বানানো হয়েছিল। তখন ছিল মাটির রাস্তা। গাড়ির তেমন চল ছিল না। তাই গাড়ি ওঠার আলাদা রাস্তা তৈরি হয়নি। এই ক্যান্টনমেন্টের সৈন্যদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। তারপর অবশ্য আলাদা করে এই ক্যান্টনমেন্টকে তেমন সক্রিয় করা হয়নি। ইংরেজটা ঠিক করলেন এই বাংলোগুলো নিলাম করবেন। কিন্তু এই পাহাড়ে কেই বা সেই বাংলো কিনবেন? তাই নিলাম হয়েছিল কলকাতায়। কলকাতার বড় বড় ব্যবসায়ী, উকিল, ডাক্তার, জমিদাররাই সেইসব বাংলো কিনলেন। বেশিরভাগ বাংলোর মালিক হয়ে গেলেন কলকাতার দিকপালরা।



প্রথম প্রথম তাঁরা ছুটি কাটাতে আসতেন। কিন্তু তারপর যা হয়! আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। এই সাইনো বাংলোর আগের নাম ছিল চন্দ্রা ভিলা। যিনি কিনেছিলেন, তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল চন্দ্রাবতী দেবী। স্ত্রীর নামেই বাংলোর নামকরণ। সেখান থেকে হাতবদল হল। কিনলেন যাদবপুরের এক মহিলা। কিন্তু তিনিও তেমন আসতেন না। আমি তখন এখানে হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতাম। আমি একদিন তাঁকে বললাম,

আপনারা তো তেমন আসেন না। বাংলোটা এভাবেই পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকে। উনি বললেন, আপনি কিনে নিন। আমার তেমন সামর্থ্য কই? তার মধ্যেও যতটা সম্ভব জোগাড় করে এই বাংলোটা কিনে নিলাম। কিছুটা মেরামত করে এখানেই থাকা শুরু করলাম। কিছু প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাংলোর স্থাপত্যকে, সাবেকিয়ানাকে ধরে রাখতে চেয়েছি।

কিন্তু সেই পরিত্যক্ত বাড়ি কীভাবে হয়ে উঠল এই সাইনো গেস্ট হাউস? প্রবীণ তাসি মোক্তান জানালেন, ‘এটা আদৌ গেস্ট হাউস হবে কিনা, আমার মনেই সংশয় ছিল। আমি ছেলেকে বলেছিলাম, এখানে কেউ থাকতে আসবে না।’ কিন্তু ও বলল, এই বাংলোর একটা ইতিহাস আছে। ভিউটাও দারুণ। ঠিকভাবে প্রোমোট করতে পারলে অনেকেই এখানে আসবে। যা করার, আমার ছেলেই করেছে। পুরো কৃতিত্বই



ওর। আমাদের বয়স হয়েছে। আমরা এসব ব্যাপারে খুব একটা জড়াই না। তবে এই বাংলোর প্রচারের ব্যাপারে একজন বাঙালির কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ। তিনি হলেন ভ্রমণ পত্রিকার সম্পাদক অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি একবার এসে পনেরোদিন এই বাংলোয় ছিলেন। তিনি এই বাংলো নিয়ে লিখলেন, আরও অনেককে এখানে আসার পরামর্শ দিলেন। তারপর থেকে লোক আসা–যাওয়া বাড়তেই লাগল।

সাতাশি বছরের প্রবীণ মাস্টারমশাইয়ের গল্প বলার ধরনটা বেশ আকর্ষণীয়। কীভাবে এই বাংলোর

সাবেকিয়ানাকে তিনি ধরে রেখেছেন, সেটা শুনলে সত্যিই কুর্নিশ করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আমাদের বুকিং তো মাত্র একদিনের। তাকদাকে বিদায় জানিয়ে চলে যেতে হবে অন্য ঠিকানায়। সবকিছু গোছগাছ করে যখন নামছি, ইচ্ছে হল ওই প্রবীণ মানুষটির সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়ার। যদি আর কখনও দেখা না হয়! আমাদের অবাক করে উনি চিৎকার করে পরিষ্কার ঝরঝরে বাংলায় বললেন, 'আশা করছি, আবার দেখা হবে।'

হ্যাঁ, তাকদার প্রতি এই ভালবাসা একদিনে ফুরোনোর নয়। তাই মেঘ মাখা এই ছোট্ট পাহাড়ি গ্রামে আবার আসতেই হবে। এই তাকদার পরতে পরতে আরও কত অজানা ইতিহাস লুকিয়ে আছে। প্রবীণ ওই মাস্টারমশাইয়ের কাছে আরও কত গল্প শোনার আছে। আপাতত, গুডবাই তাকদা।

মেঘের দেশের হাতছানি, নির্জন সেই দাওয়াইপানি



বাঙালির জীবনে দাদার অভাব নেই। ফেলুদা, ঘনাদা, টেনিদা, ভজাদা, ব্রজদা। এমন কত দাদা ছড়িয়ে আছে সাহিত্যে। আর পাড়ায় পাড়ায় তো বিচিত্র সব দাদার সমাহার। কিন্তু বাঙালির বেড়ানোর কথা উঠলেই আরও এক দাদা চলে আসে। সে হল দীপুদা। তার মানে হল, দীঘা–পুরী–দার্জিলিং।

বাঙালি রেস্তোরাঁয় গিয়ে মেনু কার্ড খুঁটিয়ে দেখে। কোনটা কেমন, তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে। ওয়েটারকে নানা প্রশ্ন করে। কিন্তু অর্ডার দেওয়ার সময় শেষমেশ সেই চিলি চিকেন। তার বাইরে আর বেরোতে পারে না। বেড়ানোর ক্ষেত্রেও তাই। নানা জায়গা নিয়ে গবেষণা করবে। পাড়ায়, অফিসে, চায়ের দোকানে নানা লোকের মতামত নেবে। ইদানীং আবার অনেকে ফেসবুকে এক লাইন লিখে দিচ্ছেন, পাহাড়ে তিনদিনের জন্য কোথায় যাওয়া যায়? ঘনঘন কমেন্ট উপচে পড়ছে। কে কত জানেন, এই সুযোগে উজাড় করে দিচ্ছেন। কিন্তু যিনি মতামত চাইলেন, তিনি শেষমেশ কোথায় গেলেন? খোঁজ নিয়ে দেখুন, সেই দীঘা, পুরী বা দার্জিলিং। এই বৃত্তেই তিনি আটকে পড়েছেন।

এই তিনটে জায়গাই অনেকবার গেছি। তাই ঠিক করেই নিয়েছিলাম, এবার এই তিনটে জায়গা বাদ দিয়ে

অন্য কোথাও। পাহাড়েই যাব। কিন্তু দার্জিলিং নয়। এক বন্ধু সন্ধান দিল দাওয়াইপানি। সে নাকি মাস খানেক আগে ঘুরে এসেছে এই পাহাড়ি জনপদ থেকে। কয়েকটা হোম স্টের ফোন নম্বরও দিয়ে দিল। মনে হল, যাওয়ার



আগে অন্তত হোম স্টে গুলোর সঙ্গে একবার কথা বলে নেওয়া যাক। কবে ফাঁকা আছে, কীভাবে বুকিং করব, এগুলো জেনে রাখতে তো ক্ষতি নেই। ফোন করে

ফেললাম বীরেন রাইকে। খুব গুছিয়ে কথা বলেন, এমন নয়। কিন্তু অল্প কথায় আন্তরিকতা মন ছুঁয়ে গেল। চলো পানসি, দাওয়াইপানি।

কিন্তু এমন নাম কেন? দাওয়াই মানে তো ওষুধ। আর পানি মানে জল। ওষুধ আর জলের কী সম্পর্ক? জানা গেল, অনেক আগে এখানে এক ইংরেজ সাহেব থাকতেন। তাঁর পায়ে একটা ক্ষত তৈরি হয়েছিল। অনেক ডাক্তার দেখানোর পরেও ঠিক হয়নি। কিন্তু কাছেই একটা ঝর্না ছিল। স্থানীয় একজনের টোটকায় সেই ঝর্নার জল নিয়মিত পায়ে লাগানোর পর নাকি সাহেবের পা ভাল হয়ে যায়। সেই সাহেব সেই ঝর্নার জলের নমুনা নিয়ে ল্যাবরেটারিতে পরীক্ষা করালেন। দেখা গেল, দুর্লভ কিছু গুণ রয়েছে সেই জলে। যা অনেকটা ওষুধের কাজ করে। অর্থাৎ, এমন পানি যা আসলে দাওয়াইয়ের কাজ করে। সেই থেকে লোকমুখে নাম হয়ে গেল দাওয়াই পানি।

আমরা ছিলাম দুই বন্ধু। একজন নিখাদ ব্যাচেলর। আর এই অধম সংসারে থেকেও কিছুটা সন্ন্যাসী গোছের। মাঝে মাঝেই বেরিয়ে পড়ি। এনজেপি তে নেমে চাইলে ভাড়া গাড়িও নেওয়া যায়। কিন্তু আমাদের বড় বাহিনীও নয়। আবার বেশি মালপত্তরও নেই। অগত্যা দার্জিলিংগামী শেয়ার গাড়িতে নেমে গেলাম জোড়বাংলোয়। সেখান থেকে রিজার্ভ করে দাওয়াইপানি। জোড়বাংলো থেকে মোটামুটি এক ঘণ্টা। গিয়ে পৌঁছে গেলাম বীরেনজির আস্তানায়।

মেঘের দেশে তো আগেই পৌঁছে গিয়েছি। রোহিনী পেরিয়ে একটু একটু করে পাহাড়ে উঠতেই গাড়ির জানালা দিয়ে মেঘ ঢুকে পড়ছে। হালকা একটা হিমেল হাওয়া যেন অন্য এক মাদকতা এনে দিচ্ছে। আগামী কয়েকদিন এই মেঘই আমাদের সঙ্গী, এটা ভেবে পরতে পরতে একটা রোমাঞ্চ যেন তাড়া করছে। গাড়ি থেকেই বীরেনজির সঙ্গে বেশ কয়েকবার



কথা হয়ে গেছে। আমরা ট্রেন থেকে নামলাম কিনা, কতদূরে আছি, কোন পথে আসছি, খোঁজ নিলেন। পৌঁছে যেতেই একগাল হাসি। বুঝলাম, আগামী তিনদিন আতিথেয়তায় কোনও ত্রুটি হবে না।

বাড়ির সামনেই একটা বেঞ্চ পাতা। ঘরে ঢোকার আগেই সেদিকে চোখ চলে গেল। সামনে একেবারে খোলা জায়গা। সামনে কোনও বাড়ি নেই। কোনও

জনপদ নেই। একেবারে খোলা পাহাড়। দূরে নাম না জানা সব পাহাড়ের সারি। আহা, এই বেঞ্চে বসেই তো অনন্ত সময় কেটে যায়। গেয়ে উঠলাম, ‘আমার আর কোথাও যাওয়ার নেই। কিচ্ছু করার নেই।’ আসার পথে কার্শিয়াংয়ের কাছাকাছি একপ্রস্থ ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে। ফলে, পেটে তেমন টান নেই। একটু বেরিয়ে পড়লে মন্দ হয় না। ব্যাগ রেখে, একটু ফ্রেস হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পাইনের জঙ্গল তো আছেই। নাম না জানা গাছের ভিড়। সেই গাছের ফাঁকেই আপনমনে মেঘ খেলে যাচ্ছে। এই রাস্তা দিয়ে অনন্ত পথ হেঁটে যাওয়াই যায়। একটু চড়াই উতরাই আছে। তাই নামতে গেলে মনে হচ্ছে, এই পথে আবার উঠে আসতে হবে। পায়ে পায়ে চলতে চলতে আরও একটা হোম স্টে চোখে পড়ল। নামটা ভারী সুন্দর— আড্ডা হাট। খোঁজ নিয়ে জানলাম, এক বঙ্গসন্তান নাকি এটি তৈরি করেছেন। বেশ গোছালো। কিন্তু মুশকিলটা হল, রাস্তা থেকে অনেকটা পথ উঠতে

হয়। আমাদের হয়তো সমস্যা হবে না। তবে বয়স্ক লোকেদের পক্ষে এতটা পথ বারবার ওঠা–নামা করা মুশকিল। একটু নীচেই চোখে পড়ল আরও একটা হোম স্টে— রোভার্স স্টে।

সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে আপন মনে হেঁটে গেলাম। অনেকটা উদ্দেশ্যবিহীনভাবেই। আমাদের তো কোনও তাড়া নেই। আমরা তো গায়ে মেঘ মেখে আপন মনে হেঁটে বেড়াতেই এসেছি। সোয়া একটা নাগাদ একটা অচেনা নম্বর থেকে ফোন। বীরেনজির ডাক, 'সাব লাঞ্চ রেডি। আপলোগ কাঁহা হ্যায়।' চাইলে আরও অনেকদূর হাঁটাই যেত। কিন্তু মনে হল, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেলে খেতে ভাল লাগবে না। তাছাড়া, বীরেনজি এত যত্ন নিয়ে বানিয়েছেন, অহেতুক ঠাণ্ডা করতে যাবই বা কেন? ফিরে এলাম হোম স্টে–তে। কিন্তু এখনও তো স্নান হয়নি। সফরসঙ্গী বন্ধু বলল, রোজ তো স্নানের পর খাই। এই পাহাড়ে না হয় উল্টোটাই

হোক। তথাস্তু। ডাইনিংয়ে গিয়ে দেখলাম, দারুণভাবে টেবিল সাজিয়েছেন বীরেনজি। গরম ভাত, পাহাড়ি ডাল, ফুলপি–আলুর সবজি, স্যালাড, রাই শাক, ডিমের ঝোল সঙ্গে পাপড়। এই পাহাড়ে কে আর ক্যালরির হিসেব কষে! বাইরে গেলে ওই খাদ্য সংযম শিঁকেয় তুলে রাখাই ভাল। বীরেনজি মাঝে মাঝেই এসে জিজ্ঞেস করে যাচ্ছেন, 'স্যার, অর কুছ চাহিয়ে! খানা ঠিকঠাক হ্যায় তো?' এমন সুস্বাদু খাবার। তার সঙ্গে এমন আন্তরিকতা। মন ছুঁয়ে যাওয়ার মতোই।

খাওয়ার পর স্নান সেরে কিঞ্চিত বিশ্রাম। পরে মনে হল, আরও এক রাউন্ড ঘুরে এলে কেমন হয়। বাইরে এসে শুয়ে–বসে দিন কাটাব? একটু পরেই তো ঝুপ করে সন্ধে নেমে যাবে। তখন তো আর কোথাও যাওয়ার থাকবে না। এমনকী ঠান্ডায় বাইরে বসাও মুশকিল। তাই, মিস্টি রোদ থাকতে থাকতে আরও এক রাউন্ড হেঁটে আসা যাক। বীরেনজি দেখিয়ে দিলেন অন্য



একটা রাস্তা। সিঞ্চোল ফরেস্টের ভেতর দিয়ে। সেই রাস্তাটাও ভারী চমৎকার। আপনমনে সেই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হেঁটে গেলাম। যতদূর মন চায়। ফিরে এলাম সন্ধে নামার মুখে। আকাশ দুপুরদিকে মেঘলা ছিল। তাই শ্রীমান কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন দেননি। গোধূলির লাল আভা গিয়ে পড়ল সেই কাঞ্চনজঙ্ঘায়। আহা, কী অপূর্ব ক্যানভাস।

উল্টোদিকের পাহাড়গুলোয় একে একে জ্বলে উঠছে আলো। মানচিত্রটা একটু বোঝার চেষ্টা করলাম।

কোনদিকটা দার্জিলিং, কোনদিকটা লেবং, কোনদিকটা তাকদা। কী আশ্চর্য, এখান থেকে সিকিমের নামচির আলোও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এসব দেখেই বোধ হয় বিশ্বকবি লিখেছিলেন, তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা। দূর পাহাড়ের ওইসব চেনা–অচেনা জনপদ যেন আলোর মালা জ্বেলে হাতছানি দিচ্ছে। ওদিক থেকেও হয়ত আমাদের মতো কোনও টুরিস্ট দেখছে দাওয়াইপানি। এদিকের আলোগুলোও কি ওদিক থেকে দেখা যাচ্ছে? রাত বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ঠাণ্ডা হাওয়াও। শীতবস্ত্র গায়ে চাপিয়েও কাঁপুনি এড়ানো যাচ্ছে না। তারই মাঝে সন্ধের টুকটাক স্ন্যাক্সের পর রাতের খাবারও তৈরি।

পাহাড়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার রেওয়াজ। কিন্তু আমরা তো এত সুবোধ বালক নই। এত তাড়াতাড়ি খাওয়ার অভ্যেস নেই। যস্মিন দেশে যদাচার। যেখানকার যা নিয়ম, তা মেনে চলাই ভাল।

আমরা রাত জাগি বলে এই পাহাড়ি সহজ-সরল মানুষগুলোকে অহেতুক জাগিয়ে রাখার কোনও মানে হয় না। সাড়ে আটটার মধ্যে ডিনার কমপ্লিট। আবার ঠাণ্ডায় বাইরে বসাও মুশকিল। মাঝে মাঝেই এসে বসছি সেই বেঞ্চে। আবার ঠাণ্ডায় কখনও ফিরে যাচ্ছি ঘরে। মোবাইলে অনেক সিনেমা, নানা রমক ভিডিও ডাউনলোড করাই আছে। চাইলেই দেখা যায়। কিন্তু এই পাহাড়ে এসে মোবাইল থেকে যত দূরে থাকা যায়, ততই ভাল। এভাবেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম, কে জানে!

ঘুম ভেঙে গেল বেশ ভোরের দিকেই। সাত সকালেই অন্য একটা রাস্তা ধরে আরও এক রাউন্ড হেঁটে এলাম। একটু একটু করে ঘুম ভাঙছে পাহাড়ের। চেনা মোরগের ডাক তো আছেই। সেইসঙ্গে নাম না জানা কত পাখির কিচির মিচির। একটু একটু করে রোদও উঠছে। এখানে ভিউ পয়েন্টের জন্য মাইলের

পর মাইল হাঁটতে হয় না। একেকটা বাঁকে দাঁড়িয়ে পড়ুন। সেটাই যেন ভিউ পয়েন্ট। আর আমরা যে হোম স্টে–তে উঠেছি, সেটা নিজেই তো এই এলাকার সেরা হোম স্টে। ঝকঝকে আকাশ থাকলে বিছানা থেকেই দিব্যি দৃশ্যমান হয় কাঞ্চনজঙ্ঘা। আর উঠোনের ওই বেঞ্চিতে গিয়ে বসলে তো কথাই নেই। একটু উঁকি দেওয়া নয়, অনেকটা রেঞ্জজুড়ে তার বিস্তার। সূর্যের আলো গিয়ে ঠিকরে পড়ছে ওই বরফঢাকা শ্বেতশুভ্র পাহাড়ের ওপর। পরতে পরতে বদলে যাচ্ছে সেই পাহাড়ের রং। এমন স্নিগ্ধ ভোর কতদিন দেখিনি। এ কোন সকাল যা জীবনের সব গ্লানি মুছে দিয়ে যায়। এমন সুন্দর সকালই তো একটা সুন্দরতর দিনের জন্ম দিয়ে যায়। আরও একটা দিন। তারপর পাহাড়জীবন শেষ। কিন্তু এই সকালের রেশটা যদি বাকি দিনগুলোতেও ধরে রাখতে পারতাম! দাওয়াইপানি, এই অনুভূতিটুকু সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার আপত্তি নেই তো!

সাহেবি সেই ভূত-বাংলোয়



অনেকবার পাহাড়ের ডাকে সাড়া দিয়েছি। বলা ভাল, মাঝে মাঝেই মনটা কেমন পাহাড় পাহাড় করে। গড়পড়তা বাঙালির একটা অদ্ভুত ব্যামো আছে। সে পাহাড় বলতেই বোঝে দার্জিলিং। আর সিকিম হলে গ্যাংটক। আরে বাবা, এর বাইরেও যে একটা বিরাট

পাহাড় পড়ে আছে, সেটা কে বোঝায়! এনজেপি–তে নামুন। দার্জিলিং–দার্জিলিং আর গ্যাংটক–গ্যাংটক চিৎকার শুনে আপনার কান ঝালাপালা হয়ে যাবে। যেন তার বাইরে কোনও জায়গাই নেই। কার্শিয়াং বা কালিম্পংকে ঘিরে আশেপাশে কত ভাল ভাল জায়গা। সেখানে গড়পড়তা টুরিস্ট গেলই না। সে দার্জিলিং নিয়েই মেতে রইল।

কয়েকমাস আগের কথা। তখনও করোনা বা লকডাউন নামক শব্দগুলো বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে ঢুকে পড়েনি। কোথায় যাই, কোথায় যাই? নানা আলোচনা হল বটে। কিন্তু ঘুরেফিরে সেই পাহাড়। এবারও সেই একই ফর্মুলা। আগে এনজেপি পর্যন্ত টিকিট তো কেটে রাখা যাক। বাকিটা না হয় পরে ভাবা যাবে।

কালিম্পং শহরটা কোনওবারেই তেমন ভাল লাগেনি।

বড্ড ঘিঞ্জি। আশেপাশে অনেক ভাল জায়গা আছে। সেসব জায়গায় গিয়েছি, থেকেওছি। কিন্তু শহরটায় এলেই যেন একরাশ বিরক্তি। কিন্তু এবার আমাদের ঠিকানা হল সেই কালিম্পং। তবে শহরের ভিড় বা যানজট থেকে একটু অন্যদিকে, মর্গান হাউসে।

ভূত বাংলো হিসেবে পরিচিতি আছে। গুগলে গিয়ে হন্টেড হাউস সার্চ করলে একেবারে শুরুর দিকেই এই বাংলোটার কথা পাবেন। নানা গল্প ছড়িয়ে আছে। আর ইদানীং নতুন উৎপাত হয়েছে ট্রাভেল ভ্লগার। ভিউয়ার বাড়ানোর জন্য যা খুশি গল্প ফেঁদে দিচ্ছে। যার অধিকাংশরই কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। কিন্তু লোকমুখে এমন কত লোকগাথা ছড়িয়ে যায়। গল্পের ডালপালা আর আর কবে যুক্তি–বুদ্ধির সরণি বেয়ে হেঁটেছে! তবে ভয়ের কোনও কারণ নেই। দুই রাতে আমরা অন্তত কোনও সাহেব ভূত বা বাঙালি ভূতের দেখা পাইনি। অবশ্য মাঝরাতে বাংলোর লনে ঘুরে



বেড়ানোর দুঃসাহসও দেখাইনি। কারণ, কোনও অ্যাডভেঞ্চার করতেও যাইনি, ভূতের ইন্টারভিউ নিতেও যাইনি। গিয়েছিলাম নিখাদ বেড়াতে। ফলে, দুঃসাহসটা কোয়ারেন্টিনে রেখেই গিয়েছিলাম।

সাহেবি আমলের বাংলো। দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত অবস্থাতেই ছিল। এখন অবশ্য পর্যটন দপ্তরের অধীন। কলকাতা থেকে বুকিং করা যায়। অনলাইনেও বুকিং

করা যায়। কোন কোন সেলিব্রিটি এসেছেন, সেই তালিকা করতে গেলে অনায়াসেই সেঞ্চুরি ছাপিয়ে যাবে। অনেকের কাছেই মর্গান হাউসের কথা শুনেছি। পরে ইউটিউবেও কিঞ্চিৎ চর্চা হল। মনে হল, যাওয়া যেতেই পারে। বুকিংও পাওয়া গেল। তবে দুদিনের। এনজেপি থেকে সরাসরি গাড়ি নেওয়া যায়। খরচ বাঁচাতে চাইলে, পানিট্যাঙ্কির মোড়ে এসে শেয়ার গাড়ি ধরে কালিম্পং। স্ট্যান্ডে এসে সেখান থেকে একটা লোকাল ট্যাক্সি নিতে পারেন।

অনেক ভুল ধারণা ভেঙে গেল। যে কালিম্পংকে কিছুটা তাচ্ছিল্য করতাম, সেই কালিম্পং যেন নিজেকে অন্য চেহারায় ধরা দিল। এই কালিম্পংকে আগে তো কখনও দেখিনি। ঢুকতেই বিশাল এক লন। এখানে বসে শীতের রোদ গায়ে মেখেই অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যায়। লনে চেয়ার, টেবিল পাতা। অর্থাৎ গা এলিয়ে আড্ডা দেওয়ার পটভূমি তৈরি করাই আছে।



এছাড়াও নানা প্রান্তে পার্মানেন্ট বেঞ্চ লাগানো আছে। একেবারেই সাবেবি বাংলো। বাইরে থেকে দেখে মনে হবে পোড়ো বাড়ি। দেওয়াল বেয়ে বট গাছের ঝুরি নেমে আসছে। আসলে, ভেতরটা ঝাঁ চকচকে করলেও বাইরের চেহারাটা ইচ্ছে করেই বদলানোর চেষ্টা হয়নি। বলা ভাল, উন্নয়নের নামে অহেতুক পুচ্ছপাকামি করা হয়নি। কর্পোরেট আদল আনতে গেলে সাবেকিয়ানাটাই হারিয়ে যেত। ভেতরের

সিঁড়ি থেকে মেঝে, সবই কাঠের। ফলে, অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ। আর ঘরটার তো তুলনা নেই। ছোটখাটো একটা ফুটবল মাঠ বলা যায়। অথচ, ভাড়া যে খুব বেশি, তাও নয়। দার্জিলিংয়ের বিভিন্ন ঘিঞ্জি হোটেলগুলোর ভাড়া আড়াই–তিন হাজার। অথচ, এখানে ১৮০০ বা ২১০০ টাকার ঘরগুলো যেন রাজকীয়। জানালার পর্দা সরালেই ধরা দেবে পাহাড়ের নানা চূড়া। মেঘ এসে ঢুকে পড়বে জানালা দিয়ে। পাশেই ছাদে গেলে ধরা দেবে পাহাড়ের অন্য দিকগুলো। টুরিস্টের আনাগোনা ভালই। ফলে, সাহেবি বাংলার লাগোয়া এলাকায় কিছু অ্যানেক্স কটেজ তৈরি হয়েছে। ঝাঁ চকচকে, অত্যাধুনিক। তবে, থাকতে হলে আদি মর্গান হাউসে থাকাই ভাল।

একটু বাইরে টহল দেওয়া যাক। এই এলাকাটা কিন্তু সেনাবাহিনী এলাকার মধ্যে পড়ে। ফলে, অকারণ যানজট নেই। কাছ থেকে সেনা ব্যারাক দেখার সুযোগ



কজনের আর হয়! বাইরে বেরোলেই চোখে পড়বে বিরাট এক গল্ফ কোর্স। এটাও সাহেবদের বানানো। এখন সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। কত ছবির শুটিং যে হয়েছে, তার ইয়াত্তা নেই। কোনও একটা চেনা ছবির কথা নিশ্চিতভাবেই মনে পড়ে যাবে। সেনাবাহিনীর একটা সুন্দর সাজানো ক্যান্টিন। সেখানে এটা-সেটা খেতে খেতে তাকিয়ে থাকুন ওই দিগন্ত বিস্তৃত গল্ফ কোর্সের দিকে। বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে সন্ধের দিকে। সে এক চোখজুড়োনো ক্যানভাস।

পরেরদিন সাতসকালে বেরিয়ে পড়ুন। হেঁটে হেঁটে

যেখানে খুশি। আর্মি এলাকার ভেতর দিয়েই আপনি হেঁটে চলেছেন। তবে, তেমন কড়াকড়ি নেই। প্রশ্নবানের মুখেও পড়তে হবে না। গাড়ি নিয়ে ঘুরলে হয়ত টুকটাক জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে পারেন। কিন্তু পায়ে হেঁটে ঘুরলে কেউই জেরা করবে না। সেনা জওয়ানদের জীবনযাত্রা এত কাছ থেকে দেখার সুযোগটা হল বাড়তি পাওনা।

সামনেই একটা চৌমাথা। একেক দিকে একেকটা রাস্তা চলে যাচ্ছে। যেটা খুশি ধরে ফেলুন। একের রাস্তার একেক রকম দৃশ্য। একটা রাস্তা চলে গেছে গুম্ফার দিকে। নাম: দূরপিন দাড়া মনেস্ট্রি। সেই বৌদ্ধ গুম্ফা থেকেই না হয় ঘুরে আসুন। দূর থেকে খুদে সন্ন্যাসীদের কান্ডকারখানা দেখে যান। এক অনাবিল আনন্দ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। চাইলে, ওদের সঙ্গে টুকটাক আড্ডাও দিতে পারেন। মন্দ লাগবে না।

ফাঁকা রাস্তা ধরে কিছুদূর নেমে যান। বাঁকের মুখে একটা ভিউ পয়েন্ট। সেখানে দুদণ্ড সময় কাটাতে পারেন। হাঁটতে পারলে তো ভালই। না পারলেও চিন্তা নেই। সেনাবাহিনীর অনেক গাড়ি ওপরে উঠছে। হাত দেখিয়ে টুরিস্ট পরিচয় দিলে ওঁরা ঠিক মর্গান হাউসের মুখে ছেড়ে দেবেন। অন্তত আমাদের কোনও সমস্যা হয়নি। ফিরে এসে আবার ওই কফি শপে একটু আড্ডা দিন। বিকেলে আবার কোনও একটা রাস্তা বেছে নিন। কোথাও সূর্যোদয়, কোথাও সূর্যাস্ত। মোদ্দা কথা, অহেতুক ব্যস্ততা নয়। আপন মনে হেঁটে বেড়ান। প্রতিটি মুহূর্ত নিজের মতো করে উপভোগ করুন।

পাহাড়ি গ্রামে মামাবাড়ির আবদার



বছর তিনেক আগেকার ঘটনা। দার্জিলিংয়ে গিয়েছিলাম। ঠিক ভাল লাগছিল না। তিনজনের টিম। দুদিনেই অনেকটা ঘোরা হয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল, এবার অন্য কোথাও গেলে কেমন হয়। হাতে তখনও তিনদিন। কারণ, তিনদিন বাদে ফেরার টিকিট। এই তিনদিনে কোথাও একটা যাওয়াই যায়।

দুই বন্ধু একমত হলাম, কার্শিয়াংয়ের কাছে ডাউহিলে গেলে কেমন হয়! জায়গাটা দারুণ, কিন্তু থাকার জায়গার অভাব। একটা ফরেস্টের বাংলো আছে। কিন্তু বুকিংয়ের হাজার ঝামেলা। ডিএফও–কে ফ্যাক্স করতে হবে। তারপর কবে তার রিপ্লাই আসবে, কে জানে! উত্তর ইতিবাচক হওয়ার সম্ভাবনাও কম।

হঠাৎ, চোখে পড়ল দার্জিলিং ডিএফও–র অফিস। সাহস করে ঢুকেই পড়লাম। নিজেদের ইচ্ছের কথা জানালাম। উনি বললেন, এটা তো আমার কিছু করার নেই। ওটা কার্শিয়াং ডিএফও–র আন্ডারে পড়ছে।

তাঁকে বললাম, অতশত জানি না। আপনিই কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিন। আমরা চেষ্টা করলে হবে না, এটুকু জানি। আপনি চেষ্টা করলে হতেও পারে। একটু চেষ্টা করে দেখুন না।

উনি বললেন, কাল আসুন। আমি দেখে রাখব। যথারীতি পরের দিন গেলাম তাঁর দপ্তরে। বললেন, ‘ওখানে এখন মেরামতি হচ্ছে। আপনারা বরং মিরিক চলে যান।’ কেন জানি না, মন সায় দিল না। আগেও মিরিক গেছি। আলাদা করে দুদিন থাকার মানে হয় না।

অগত্যা সেইদিনই একটা গাড়ি ধরে নেমে গেলাম। ঠিক করলাম, কার্শিয়াংয়ে নামব। তারপর আশেপাশের কোথাও একটা জায়গা ঠিক খুঁজে নেব। গাড়িতেই একজনের সঙ্গে গল্প হচ্ছিল। আশেপাশে কোথাও রেয়ার স্পট আছে কিনা। তিনি বললেন চিমনির কথা। কাকে একটা ফোন করে নম্বরও জেনে নিলেন।

ফোন করা হল। যিনি ধরলেন, তিনি সটান জানিয়ে দিলেন রুম খালি নেই। কী আর করা যাবে। মন মরা

হয়ে বসে রইলাম। হঠাৎ, মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি চেপে গেল। মনে হল, চিমনির সেই ভদ্রলোককে আবার ফোন করি। করলাম। শুরুতেই বললাম, দেখুন, আমি জানি আপনি বলবেন রুম নেই। আপনার 'না' শোনার জন্য ফোন করিনি। আমরা আসছি। আপনি ব্যবস্থা করন। এটা বলার জন্য ফোন করেছি।

উনি তো ঘাবড়ে গেলেন। আমতা আমতা করে হিন্দি –নেপালি মিশিয়ে বলতে চাইলেন, রুম নেই। আমরাও নাছোড়। বললাম, 'শুনুন ভাইয়া, এতদূর থেকে যখন এসেছি, তখন ফিরে যাব না। আমরা থাকব, ব্যাস। কোথায় রাখবেন, সেটা আপনার ব্যাপার। আমরা রান্নাঘরেও থাকতে পারি। ডাইনিংয়েও থাকতে পারি। আপনার ঘরেও থাকতে পারি। আপনি বরং এক–দু রাতের জন্য অন্য ঠিকানা খুঁজে নিন। কোনও বন্ধু বা আত্মীয়ের বাড়িতে চলে যান।'



এমন আজগুবি আবদার তিনি নিশ্চয় এই জন্মে শোনেননি। মনে মনে নির্ঘাত ভাবছিলেন, এ আবার কি আজগুবি টুরিস্ট রে বাবা। একেবারে ‘তু মান ইয়া না মান, ম্যায় তেরা ম্যাহেমান!’ বলছি রুম নেই, তাও নাছোড়বান্দা! আমার এক সিনিয়র কলিগ একবার বলেছিলেন, ‘ও কী ভাবছে, সেটাও যদি

আমি ভাবতে শুরু করি, তাহলে ওর কাজটা কী? ওর ভাবনা ওকে ভাবতে দাও, তোমার ভাবনা তুমি ভাবো।' গুরুজনবাক্য স্মরণ করে, কার্শিয়াং থেকে একটা আলাদা গাড়ি নিয়ে চলে গেলাম চিমনির দিকে। অনেকটাই ডাউহিলের রাস্তায়। ইচ্ছে ছিল একবার ডাউহিলে নামার। কিন্তু এমন বৃষ্টি, নামার সুযোগ হল না। গাড়ি চলল চিমনির দিকে। গিয়ে থামল সেই হোম স্টে–র সামনে।

রাস্তার ধারেই চমৎকার হোম স্টে। পুরোটাই প্রায় ফাঁকা। মালিক বেরিয়ে এলেন। বললাম, এসে গেছি। এবার ব্যবস্থা করুন। উনি একটা সুন্দর ঘরে নিয়ে গিয়ে তুললেন। বললাম, 'পুরোটাই তো ফাঁকা, তাহলে যে বললেন রুম নেই।' উনি কিছুটা লজ্জায় পড়ে গেলেন। বললেন, আসলে এক–দুটো রুমে লোক রেখে লাভ হয় না। সেই এক–দুজনের জন্য রান্না করতে হয়। একসঙ্গে অন্তত তিন–চারটে রুমে



বুকিং থাকলে সুবিধা হয়। সেই কারণেই বলেছিলাম, রুম নেই।

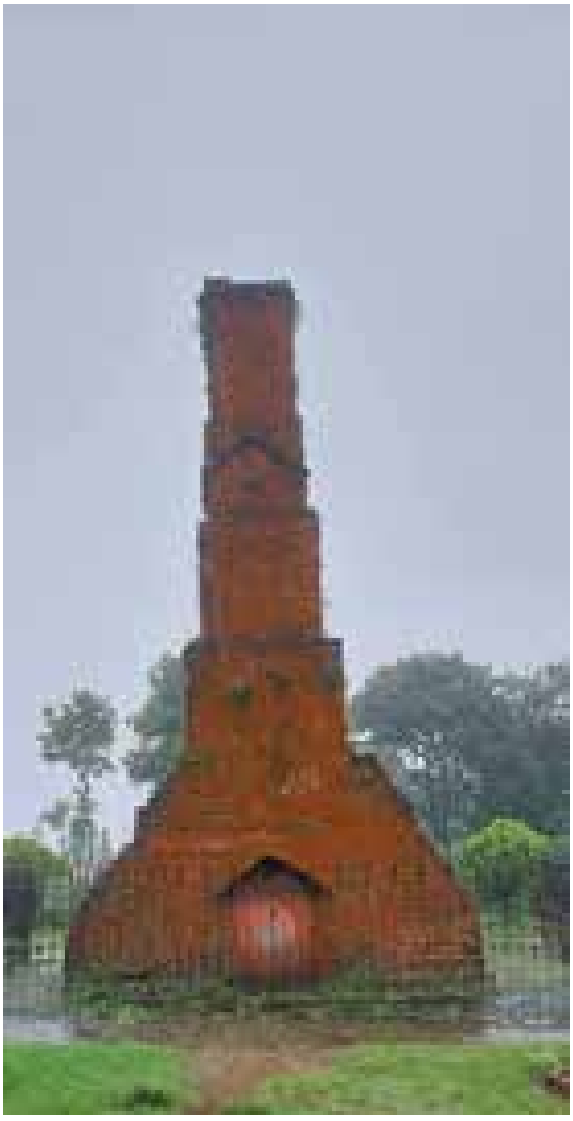
তাঁর সমস্যাটা বুঝলাম। তিনি যে রুম নেই বলেছিলেন, তার জন্য দেখলাম বেশ কুণ্ঠিত। পরে ভেবে দেখলাম, তাঁর জায়গায় আমরা থাকলে আমরাও হয়তো এই নিরীহ মিথ্যেরই আশ্রয় নিতাম। সত্যিই তো, দুটো লোকের জন্য এত ঝামেলা নেওয়ার কী দরকার! আমরা আপাতত দুদিনের অতিথি। কিন্তু আকাশের যা

অবস্থা, সারাক্ষণ বৃষ্টি। অনেকে বলেন, পাহাড়ে বৃষ্টির সময়টা এড়িয়ে যেতে হয়। হয়তো ঠিকই বলেন। কিন্তু যদি চোদ্দটা জায়গায় ঘুরেছি, এমন ফিরিস্তি তুলে ধরার দায় না থাকে, তাহলে বরং বৃষ্টির সময়েই পাহাড়ে যান। হয়তো কোথাও বেরোতে পারছেন না বলে সাময়িক বিরক্তি আসতে পারে। কিন্তু মন দিয়ে যদি উপভোগ করতে পারেন, তাহলে বুঝবেন, এই বৃষ্টিটাও বাড়তি এক পাওনা। এমন অলস বৃষ্টি দেখার সুযোগ তো খুব বেশি পাই না। ‘এসো করো স্নান নবধারা জলে বলবে কে আর/শহরে বৃষ্টি জল কাদা মাখা নোঙরা দেদার।’ প্রাণখুলে আড্ডা দিয়েছিলাম। কত গান গেয়েছিলাম। কত পুরানো স্মৃতি হাতড়েছিলাম। আর মাঝে মাঝেই ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়ছি। এর তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিচ্ছি। দ্বিতীয় দিন একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আশপাশের এলাকাটা ঘুরে দেখলাম। রাস্তাটা তখন একেবারে এবড়ো খেবড়ো ছিল। শুনলাম, কয়েকদিন

পরেই নাকি ঠিক হয়ে যাবে। জানি না, আজও ঠিক হয়েছে কিনা।

ওই দুর্গম পাহাড়ি পথে, ওই বৃষ্টির মাঝেও ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। যাওয়াটা না হয় সহজ। নেমে গেলেই হয়। কিন্তু কার্শিয়াং থেকে হেঁটে ফিরে আসছে! সত্যিই পেন্নাম করতে ইচ্ছে হল। আমরা যদি এই দুর্গম এলাকায় থাকতাম, কোনকাল লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে দিতাম। ড্রপ আউটের তালিকায় আমাদের নামগুলো জ্বলজ্বল করত। বিদ্যাসাগরের স্ট্রিট লাইটে পড়ার থেকেও এই পাহাড় ডিঙিয়ে স্কুলে যাওয়া কোনও অংশে কম রোমাঞ্চকর নয়। স্কুলে যাওয়াও যেন এক দুঃসাহসী অ্যাডভেঞ্চার। পাহাড়ের ছোট ছোট জনপদ। জীবনের পরতে পরতে কত যে বিস্ময় ডেকে আনে!

সবমিলিয়ে দুদিনের ট্যুরটা মন্দ হয়নি। মাঝে মাঝে



রোদ। মাঝে মাঝে বৃষ্টি। ‘এসো হে আষাঢ় ছাতায় তোমায় বরণ করি।’ গ্রাম্য কিছু দোকান। ইচ্ছেমতো মোমো, সিঙ্গাড়া খাওয়াই যায়। কতরকম ফলের গাছ। গোটা গ্রামটাই যেন নিজেদের গ্রাম। যেন যার ঘরে যখন খুশি ঢুকে পড়া যায়। ইচ্ছে হল, একজনের বাড়িতে চা খাব। এক আন্টিকে বলামাত্রই হাসিমুখে রাজি। তিনি চা করে আনলেন। চা–টা যে দারুণ এমন নয়। কিন্তু ওই আতিথেয়তা! সত্যিই তুলনা হয় না। একবার ভাবুন তো বেহালায় বা বরানগরে কোনও বাড়িতে গিয়ে আপনি চা খেতে চাইছেন। ইভটিজার বা চোর ভেবে গণপিটুনিও জুটে

যেতে পারে। অথচ, ওঁরা কত সহজ–সরল। কত অতিথি বৎসল। জীবনের এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মুখে কী অনাবিল হাঁসি! আমরা কেন এত সহজভাবে হাঁসতে পারি না! ওঁদের ওই হাসিমুখগুলো দেখে আমাদেরও যেন আবদার করতে সংকোচ হয় না।

আবার যদি কখনও সুযোগ পাই, সেই গ্রামে যাব। জানি না, কখন যাওয়া হবে। যাঁরা এই লেখা পড়ছেন, তাঁরা বরং চাইলে ঘুরে আসতে পারেন। নেটে চিমনি লিখে সার্চ মারলেই অনেক ছবি, তথ্য পেয়ে যাবেন। দুটো দিন নিরিবিলি পাহাড়ি গ্রামে ঘুরে আসতে চাইলে আপনার ঠিকানা হতেই পারে চিমনি।

মাথার ওপর স্নিগ্ধ আকাশ, পায়ের তলায় তিস্তা



জায়গাটার কথা যাওয়ার এক মাস আগেও জানতাম না। এমনকী কোনও ভ্রমণের বইয়েও পড়েছি বলে মনে পড়ছে না। ঠিক ছিল, ফেব্রুয়ারিতে কালিম্পং লাগোয়া দু একটা জায়গায় যাব। কোথায় যাব,

সেটা না হয় পরে ঠিক করা যাবে। তার আগে এনজেপি পর্যন্ত ট্রেনের টিকিট তো কাটা থাক। এমনকী, ফেরার টিকিটটাও কনফার্ম থাকলে ভাল হয়। মোটামুটি এটাই আমাদের বেড়াতে যাওয়ার ফর্মুলা। আগে যাওয়া-আসার টিকিট কেটে নাও। তারপর না হয় মাথা গোঁজার ঠাঁই খোঁজা যাবে। সেই ভেবেই যাওয়া-আসার টিকিট কাটা হল। এবার না হয় ঠিক করা যাবে, কোথায় যাব।

এনজেপি টিকিট কাটা মানে, একসঙ্গে অনেক বিকল্প তৈরি রাখা। চাইলে দার্জিলিঙের দিকে যাওয়া যায়। কার্শিয়াং লাগোয়া বিভিন্ন সুন্দর জায়গা তো আছেই। চাইলে কালিম্পঙের দিকে যাওয়া যায়। সিকিমের দরজা তো খোলাই আছে। সেইসঙ্গে যদি মন পাহাড়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে অরণ্যে ঝুঁকতে চায়, তাহলে ডুয়ার্সও রইল। অন্য সব দিকটায় আমার গিন্নির একাধিকবার ঘোরা



আছে। একমাত্র কালিম্পঙের দিকটায় তার যাওয়া হয়নি। তাই মনে হল, এবার ওদিকেই পাড়ি দেওয়া যাক।

আগে ছিল ভ্রমণের বই। এখন তো ইউটিউব আছে। সহজেই ইচ্ছেমতো জায়গা দেখে নেওয়া যায়। সেখানেই ফোন নম্বর থেকে শুরু করে নানা তথ্য পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে সবথেকে বড় পাওনা, একটা খুঁজতে গিয়ে আরও অনেক অজানা জায়গার হদিশ পাওয়া যায়। সেভাবেই পাওয়া গেল মুঙ্গেরজং। ভিডিওতে আমি যা দেখব, গিন্নিও

তাই দেখবে। অতএব, রিসার্চের ভারটা তার ওপর ছেড়ে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। অন্তত ভাল না লাগলে সেখানে গিয়ে ‘অমৃত ভাষ্য’ শোনার ঝুঁকিটা থাকছে না।

কয়েকটা ভিডিও দেখে মন্দ লাগল না। কালিম্পং থেকে ঘণ্টা দেড়েক। মনসুং থেকে আরও কিছুটা এগিয়ে গেলেই এই মুঙ্গেরজং। সেখানেই বসন্ত তামাংয়ের হোম স্টে। তিস্তা রিভার ভিউ।

কালিম্পং থেকে যাওয়ার পথে একবার ডেলো ছুঁয়ে গেলে মন্দ হয় না। ড্রাইভার সাহেবকে একবার বলতেই তিনি রাজি। ডেলোতে আধঘণ্টা কাটিয়ে চললাম মনসুংয়ের দিকে। মনসুং তো এলাম। এবার কোনদিকে। বসন্তজিকে বারবার ফোন লাগাচ্ছি। তিনি থোড়া নসদিক, থোড়া নসদিক বলে চলেছেন। নানারকম রুট ডিরেকশন



দিচ্ছেন। এসব বোঝা বাপু আমাদের কম্ম নয়। ড্রাইভার সাহেবকেই ফোনটা ধরিয়ে দিলাম। নেপালি ভাষায় তাদের কথাবার্তা চলল। যার কিছুটা আমরা বুঝলাম। বাকিটা না বুঝলেও অনুমান করে নিলাম। তাছাড়া, আমাদের বেশি বুঝে কাজ নেই। ড্রাইভার সাহেব বুঝলেই হল। গাড়ি ফের এগোতে লাগল। এবার বুঝলাম, ড্রাইভার সাহেবও কিছুই বোঝেননি। হাঁতড়ে চলেছেন। এদিকে, বসন্তজির ফোন মাঝে মাঝেই নট রিচেবল। মহা ঝামেলা তো! এতদূর এসে ফিরে যেতে হবে! শেষমেশ একে তাকে জিজ্ঞেস করে ডেরায় পৌঁছে গেলাম।

মনে হচ্ছিল, এমন দুর্গম জানলে কে আসত! ড্রাইভার সাহেবও বলে উঠলেন, কে এই জায়গার সন্ধান দিয়েছে! আর জায়গা খুঁজে পেলেন না! কত ভাল ভাল জায়গা ছিল।

কিন্তু একটু পরেই ভুল ভাঙল। গাড়ির আওয়াজ শুনেই বসন্তজি বেরিয়ে এলেন। নিষ্পাপ হাসি মাখানো মুখ। এমনিতেই পাহাড়ে গেলে রাগ কমে যায়। তবু যেটুকু বিরক্তি ছিল, সেটাও যেন ওই হাসিমুখটা দেখে উধাও হয়ে গেল। কিছু বলার আগেই বসন্তজি বলে উঠলেন, 'আপলোগোকো আনেমে বহত তকলিফ হুয়া। উসকে লিয়ে মাফি চাতা হুঁ।' বলুন তো, এরপর আর রাগ করা যায়! তাছাড়া, উনি তো আর ঘাড় ধরে আমাদের টেনে আনেননি। আমরা ভিডিও দেখেছিলাম, ভাল লেগেছিল। ফোনে কথা বলেছিলাম। তিনিও বলেছিলেন পৌনে দু ঘণ্টার মতো লাগবে। এতে তো তাঁর কোনও দোষ নেই।

এরপর বসন্তজি নিয়ে গেলেন ঘরের দিকে। কে জানত, এমন চমক অপেক্ষা করে আছে! ঢালু হয়ে নেমে গেছে পাহাড়টা। নিচে তাকালেই দেখা যাচ্ছে তিস্তার নীল জল। মনে পড়ে গেল শ্রীকান্ত আচার্যের সেই গানটা— 'মন খারাপ হলে কুয়াশা হয়, ব্যাকূল হলে তিস্তা।' বারান্দা থেকে এই দৃশ্য দেখলে যে কোনও মানুষের মন ভাল হয়ে যেতে বাধ্য। এতটা পথ পেরিয়ে আসার ক্লান্তিটা যেন নিমেশেই তিস্তার জলে ভেসে গেছে। ড্রাইভার সাহেবও বেশ খুশি। বলেই উঠলেন, 'এতদিন গাড়ি চালাচ্ছি। এমন জায়গার কথা জানতাম না তো। নাহ, আপনারা ঠিক জায়গাই বেছেছিলেন। এবার অন্য ট্যুরিস্টদের এই জায়গায় আনাই যায়।' চলে যাওয়ার আগে বসন্তজির কাছ থেকে কার্ড নিয়ে গেলেন।

দুপুর হয়ে গিয়েছিল। পেটে খিদের সাইরেন বেজে



উঠছে। দ্রুত স্নান সেরে মধ্যাহ্নভোজে। খাওয়ার জায়গাটা দেখলে মুগ্ধতা আরও বেড়ে যাবে। সামনে একটা আলাদা চালা ঘর। সুন্দরভাবে সাজানো। পাহাড়ের হোম স্টে মানে দিনের বেলায় ডিম, রাতে চিকেন। এটা মোটামুটি কমন। কিন্তু রান্নার গুণে সেই ডিমের ঝোল শহুরে চিকেনকে দশ গোল দিতে পারে। এমনিতেই খিদের পেটে সবকিছুই সুস্বাদু লাগে। তার ওপর সত্যিকারের যদি সুস্বাদু হয়, তাহলে তো কথাই নেই। খাওয়া

দাওয়া সেরে নরম রোদ গায়ে মেখে তিস্তার দিকে মুখ করে বসে থাকা। অনেকটা নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে এই তিস্তা। অনন্তকাল এখানে বসে থাকা যায়। বসার দারুণ বন্দোবস্তও করে রেখেছেন বসন্তজি। কোথাও বেঞ্চ পাতা। কোথাও আবার বাঁশ দিয়ে বেঞ্চ বানানো। আর একটু দূরে বানিয়ে ফেলেছেন আস্ত ভিউ পয়েন্ট। সেখান থেকে তিস্তার এঁকে বেঁকে যাওয়া গতিপথ অনেকটা দেখা যায়।

শহুরে জীবনে কতদিন নির্মল, স্নিগ্ধ বিকেল দেখিনি। এমন নির্ভেজাল পাহাড়ি গ্রামে প্রাণ ভরে সেই বিকেলের স্বাদ নেওয়া। চড়াই উতরাই পথে অনেকটা হেঁটে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সন্ধে নামতে তো দেরি নেই। তাই ফিরে আসাই ভাল। অ্যাডভেঞ্চার না হয় সকালের জন্য তোলা থাক। এরই মাঝে বেশ কয়েকটা গাছে ময়ূর ডাকতে

শুরু করেছে। এক গাছ থেকে অন্য গাছে ময়ূর দিব্যি উড়ে যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, বেশ কয়েকটা গাছেই ময়ূর ডেরা বেঁধেছে। পাহাড়বাসীর কাছে এটা হয়ত কিছুই না। আমরা যেমন কাক দেখতে অভ্যস্থ, এঁরা সেভাবেই রোজ ময়ূর দেখেন। কিন্তু আমাদের কাছে এই ময়ূরের ডাকের একটা আলাদা রোমাঞ্চ তো আছেই।

এমনিতেই পাহাড়ে রাত মানে তেমন কিছু করার থাকে না। এই সময় ফোনে গল্প করতেও ইচ্ছে করে না। ঠান্ডায় বেশিক্ষণ বাইরে বসে থাকাও যায় না। কিছুক্ষণ ডাউনলোড করে সিনেমা দেখা, কিছুক্ষণ গল্প করা। আর মাঝে মাঝে বাইরে একটু উকি দেওয়া। দূরের পাহাড়ের আলোগুলো একে একে জ্বলে উঠছে। সব তারা যেন মাটিতে নেমে এসেছে। পাহাড়ে রাতে খাওয়ার পর্ব একটু তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলতে হয়। নটা মানে, এখানে

অনেক রাত। ওঁরা খুব তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েন। আমাদের কু অভ্যাসের জন্য তাঁদের জাগিয়ে রাখার মানে হয় না।

পরেরদিন সকালে উঠেই মনে হল, এবার টুকটাক অ্যাডভেঞ্চার চলতে পারে। মধ্যবিত্তের আটপৌরে অ্যাডভেঞ্চার মানে, কিছুটা পায়ে হেঁটে ঘুরে আসা। কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই। পথ যেদিকে নিয়ে যাবে।

এভাবেই যেতে যেতে কখনও বাচ্চাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে শুরু করলাম। আবার হাঁটতে হাঁটতে একটা উঠোনে দেখলাম, একটা বাচ্চা মেয়ে পড়ছে। মনে হল, একটু গল্প করে আসা যাক। কোথাও কোনও জড়তা কাজ করছে না। পুরো গ্রামটাই যেন নিজেদের গ্রাম মনে হচ্ছে। বাড়ির উঠোনে ঢুকতেই ওঁরাও চাটাই পেতে দিলেন।

একজন পুঁচকে তো একটা বেতের মোড়া এনে হাজির। ওদের আবদারে আরেক প্রস্থ চা হয়ে গেল। হালকা রোদ উঠছে, সেই রোদ গায়ে মেখে অন্যের দাওয়ায় আড্ডা দিতে মন্দ লাগছে না। খোলামেলা আড্ডায় পাহাড়কে যেন নতুন করে চিনছি।

মাঝে মাঝেই এখানে সেখানে একটু বসে পড়া। তেষ্টা পেলে নির্দ্বিধায় লোকের বাড়িতে ঢুকে জল চাওয়া। ফেরার পথে আবার সেই বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা। ওরা কেউ গান করল, কেউ নাচ করল। কেউ বাড়ি থেকে কী একটা ফল এনে দিল। এমন নিখাদ আন্তরিকতা কোথায় পাবেন!

বসন্তজির ডেরায় ফিরে মনে হল, এই পাহাড়ের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে চেনা মানুষদের চিঠি লিখলে কেমন হয়! কাগজ-পেন সঙ্গেই ছিল। লেখাও শুরু। গিন্নি লিখল তার চেনাজানা লোকেদের।

আমি লিখলাম আমার চেনাজানা লোকেদের। সবার ঠিকঠাক পোস্টাল অ্যাড্রেস হয়ত জানি না। পিন কোডও জানি না। কোথায় পোস্ট হবে, তাও জানি না। কিন্তু লিখতে তো বাধা নেই। পরে না হয় ঠিকানা জেনে নেওয়া যাবে। ফেরার পথে কালিম্পঙে পোস্ট হতে পারে। তাও যদি না হয়, কলকাতা ফিরেও না হয় পোস্ট হতে পারে।

কখনও চিঠি লিখে, কখনও পায়ে হেঁটে গ্রাম ঘুরে, কখনও অলস রোদ গায়ে মেখে তিস্তার দিকে চেয়ে থেকে। এভাবেই দ্বিতীয় দিনটাও সুন্দর কেটে গেল। পরেরদিন ফেরার পালা। ফেরার দিন মানেই মন কেমন। তবে সরাসরি সমতল নয়, আরও একটা দিন, পাহাড়েরই অন্য কোনও ঠিকানায়।

মুঙ্গেরজং তাহলে কী দিল? এক প্রগাঢ় শান্তি।

যেখানে সিবিআই নেই, ইডি নেই। কাকু নেই, ভাইপো নেই। বিরাট নেই, অনুষ্কাও নেই। অফিস যাওয়ার তাড়া নেই। টিভির ব্রেকিং নিউজ নেই। যেখানে টিভি চ্যানেলের ব্রেকিং নিউজ নেই। আতঙ্কের সংক্রমণ নেই। যেখানে আপন মনে ময়ূর ডেকে চলেছে। যেখানে পায়ে পায়ে জঙ্গল পেরিয়ে অনেকটা পথ হেঁটে যাওয়া যায়। যেখানে পায়ের তলা দিয়ে বয়ে চলেছে তিস্তা। মাথার ওপর রয়ে গেছে স্নিগ্ধ আকাশ।



বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন